নববেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামী অখণ্ডানন্দ

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

ঋগ্‌বেদের ঋষি এই মন্ত্র দর্শন করেছিলেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু' (১।৬৪।৪৬)। পরে এই ভাবনা দুটি খাতে প্রবাহিত হয়—একটি ব্যাবহারিক প্রয়োজনে, অপরটি তার ঊর্ধ্বে কেবল দার্শনিক চিন্তাবর্তে সীমায়িত। উপনিষদে প্রতিভাত হয়েছে দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত চরাচরই ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই তাদের উৎপত্তি, বিকাশ এবং বিলয়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি' (ছান্দোগ্য, ৩।১।১৪)। ঋষির ধীশক্তি আবিষ্কার করেছিল কেবলমাত্র আনন্দের আস্পৃহায় এক আনন্দ-অভিসারী মহাশক্তির রচনা এই চরাচরব্যাপী বিশ্বশিল্পকে, তাই ঋষিদৃষ্টিতে এই বিশ্বচরাচর প্রতিভাত হয়েছিল 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলে।

এই দার্শনিক যুগের শেষে রচিত হয় ব্রহ্মসূত্র, যা উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মবাদের সামগ্রিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস। ব্রহ্মসূত্রের উপর পরবর্তী কালে নানা ভাষ্য রচিত হলেও মুখ্যত তার দুটি ধারা—একটি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদী ভাবনা, অপরটি দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদেরও নানা ধারা—রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কখনও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, আবার কখনও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলে প্রতীত হলেও তিনি যে আদ্যন্ত অদ্বৈতবাদী ছিলেন তা নিশ্চিত। বিশেষ করে তিনি যখন বলছেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর', তখন বুঝতে হবে তিনি সব সাধনার শেষে অদ্বৈতবাদকেই মেনে নিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমাও একটি চিঠিতে এ-মত সমর্থন করেছেন : ''আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা (যখন) সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী।'' স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ''ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে।''[১] তাই স্বামী বিবেকানন্দ যে-বেদান্ত প্রচার করলেন তা প্রাচীন বেদান্তধারণা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, যাকে বিজ্ঞজনেরা অভিহিত করেন নববেদান্ত বলে। স্বামীজীর ভাষায় তা 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত।' তিনি তাঁর বৈদান্তিক

চেতনা আর বিশাল প্রেমিকহৃদয়কে সম্মিলিত করে, কর্মের মাধ্যমে শিবজ্ঞানে জীবসেবার নব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তার ব্যাবহারিক প্রয়োগে গুরুভাই ও শিষ্যদের উদ্দীপ্ত করলেন। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার সার্থক এক রূপকার তাঁর অন্যতম গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ।

স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গঙ্গাধর, তাই তাঁকে স্বামীজী আদর করে ডাকতেন 'গ্যাঞ্জেস' বলে। কে জানত স্বামীজীর এই আদরের ডাকের মধ্যেই নিহিত ছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপ্রণালী! মা গঙ্গা যেমন কোনও বাছ-বিচার না করে সকল জীবের পাপ গ্রহণ করে পতিতোদ্ধারিণী, তেমনি স্বামীজীর গ্যাঞ্জেসের কোনও বাছ-বিচার ছিল না আর্ত-অনাথ-আতুরদের সেবায়। অনাথ শিশুদের কাছে তিনি ছিলেন একাধারে মা ও বাবা। মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হত—সেখানে জাতপাতের কোনও প্রাচীর ছিল না, অবারিত প্রেমফল্গুধারা সকলকে সুস্নাত করত। গরিব হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে তিনি 'বাবা'। দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্দশা দেখে নিজে অন্নত্যাগ করেছিলেন দীর্ঘদিন, শাকপাতা খেয়ে থাকতেন। পরে ডাক্তারের নির্দেশে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরায় ভাত খেতে সম্মত হন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্ম কলকাতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে আশ্বিনের অমাবস্যায়। সে-বছরে বিখ্যাত 'আশ্বিনের ঝড়ে' বিপর্যস্ত কলকাতা শহর। জন্মলগ্নের পরিস্থিতিই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিতবাহী। ভারতের বিপর্যস্ত সমাজে তিনি সেবাব্রতের যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নতুন দিগ্‌দর্শনের সূচনা করেন তা আজ বহুবিস্তৃত। আকৈশোর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য আচারে অভ্যস্ত গঙ্গাধর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে আত্মোৎসর্গ করে নবচেতনায় সমৃদ্ধ হন, এবং নরেন্দ্রনাথের বিস্ফোরক ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীর অপ্রকট হলে তিনি নরেন্দ্রনাথকেই 'জীবনের ধ্রুবতারা' করে পথ চলেছেন। পরিব্রাজকরূপে বরাহনগর মঠ থেকে সমগ্র উত্তরভারত, গাড়োয়াল, কুমায়ূনের কিছু অঞ্চল ভ্রমণ করে, তিব্বত ঘুরে প্রায় তিন বছর পর মঠে ফিরে আসেন তিনি। কয়েক মাস পর স্বামীজীর সঙ্গী হয়ে উত্তর ভারতের কিছু অংশ ঘুরে স্বামীজীর ইচ্ছায় পরস্পর পৃথক গন্তব্যে যাত্রা করেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয় সব সময়েই দুঃখী ও আতুরের জন্য ব্যথিত হত। পরিব্রাজকজীবনে বহুবার নিজের পরিচ্ছদ ও শীতের পোশাক অপরের কষ্টে কাতর হয়ে দান করে নিজে শীতে কষ্ট পেয়েছেন। জামনগরের প্রখ্যাত বৈদ্য ঝণ্ডুভট বিঠঠ্‌লজীর 'ধন্বন্তরী ধাম'-এ অবস্থানকালে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকদের মুষ্টিভিক্ষায় অতিকষ্টে দিনপাত করতে দেখে কষ্ট অনুভব করেন এবং পূর্বপরিচিত কাশীর বিখ্যাত ধনী প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠি লিখে তাঁর অর্থসাহায্যে অন্নসত্র খুলে দেন। জামনগরে অবস্থানকালে ঝণ্ডুভটের মুখে দুটি শ্লোক শুনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। দুটি শ্লোকই সেবাপরায়ণতার শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। একটিতে বলা হয়েছে—সংসারে এমন কী উপায় আছে, যার দ্বারা আমি সকল প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে তাদের দুঃখ নিজেই সতত ভোগ করতে পারি? যিনি জীবনের শেষ চল্লিশ বছর অনাথ-আতুরের জন্য উৎসর্গ করবেন তাঁর কাছে এই প্রার্থনা তো জীবনসঙ্গীত। ভটজীর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে এই আবৃত্তি শুনে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভটজীর জীবনচর্যাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পরে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ''মানুষের সেবা করা এবং মানুষকে ভালবাসা যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি এই ভটজীর জীবন দেখিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করি।''

খেতড়িতে তিনি যে-সামাজিক বৈষম্য ও

অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাতে তিনি কেবল বিচলিতই হননি, প্রতিকারেও তৎপর হয়েছিলেন। এইসময়ে তাঁর মনোভাব একটি পত্র থেকে জানা যায় : ''... মুষ্টিমেয় ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের বহুকষ্টার্জিত ধনের অপব্যয় হইতে দেখিয়া আমার সকল সুখ ও শান্তি চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইল। প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং আপন ন্যায্য গণ্ডায় বঞ্চিত জনসাধারণের সেবায় এ জীবন পণ করাই... একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে হইল।

''স্বজাতির এ দুর্দিন ও দুঃখের অবসান না হইলে যে শান্তির আশা করাও বৃথা, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম।... দয়াধর্মের চির আবাসভূমি ভারতের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া আমার জীবন ঘোর অশান্তি ও দুঃখময় হইয়া উঠিল।''[২] এই মনোভাব থেকেই তিনি বদ্ধপরিকর হন শোষণ ও বৈষম্যের প্রতিকারে ব্রতী হবেন। 'স্মৃতি-কথা'তে তিনি লিখেছেন, ''রাজপুতানা প্রদেশে আট মাস বাস করিয়া নানা গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও গরীব প্রজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। গরীব প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি।''

গরিব প্রজাদের দুঃখ দূর করাই 'মানব জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম' কেন করেছিলেন? ঈশোপনিষদ বলছেন—সর্বদা পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত জেনে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে। তাই সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে তিনি ব্যথিত হয়ে থাকবেন।

এ-বিষয়ে তিনি মতামত চেয়ে পাঠালেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, ''খেতড়িতে থাকতে স্বামীজীকে এক চিঠি লিখলাম আমেরিকায়। রাত ন-টায় লিখতে বসি—লেখা যখন শেষ হল তখন ফর্সা হয়ে গেছে। পরিষ্কার করে লিখলুম—দেশের অবস্থা যা বুঝেছি ও আমি যা করতে পারি; আর জানতে চেয়েছিলাম—আমায় কি করতে হবে। উত্তরের আশায় দিন গুনতে লাগলাম; আর ভাবতে লাগলাম নানা কথা—স্বামীজী কি লিখবেন। যদি লেখেন, 'তুই সন্ন্যাসী, তোর অত মাথা ব্যথা কেন? সাধন ভজন শাস্ত্রালোচনা প্রব্রজ্যা নিয়ে থাক। ওসবে হাত দিয়ে ''অব্যাপারেষু ব্যাপার'' করতে যেও না।' যদি এরকম লিখতেন, তা হলে ঠিক ছিল—কাকেও কিছু না বলে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব।... স্বামীজীর চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। উত্তর এল।... চিঠি পড়ে বুঝলাম—ওখানে তুফান উঠেছে। তাঁর বিরাট হৃদয়ে সেবাধর্মের যে বান ডেকেছিল, তাই এসে এখানে (বুকে হাত দিয়ে) ধাক্কা দিল। আমার জীবন ও কর্মের ধারা সেইদিনই ঠিক হয়ে গেল।''[৩]

অখণ্ডানন্দজীর চিঠির উত্তরে স্বামীজী আমেরিকা থেকে যে-চিঠি লিখলেন তা ছিল সেনাপতির উদ্দীপনাময় তূর্যনিনাদ : ''খেতড়ি শহরের গরিব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করিতে না পারো। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।... গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।''

স্বামীজীর এই বাণী অখণ্ডানন্দজীর প্রাণে উৎসাহের প্লাবন এনে দিল। সব সংশয় দূরে ফেলে যা নিজের আরব্ধ কর্ম বলে স্থির করেছিলেন, স্বামীজীর সম্মতিতে তা রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। গরিব প্রজাদের অন্নবস্ত্রের অভাব, আলোবাতাসহীন ঘরে বাস, এবং তাদের অর্থশোষণ বিষয়ে তিনি খেতড়িরাজকে অবহিত করেন। রাজবিদ্যালয়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পড়বার অনুমতি তিনি খেতড়িরাজের কাছ থেকে আদায় করেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করেন। খেতড়িরাজের দাসবালকদেরও বিদ্যালয়ে পড়াতে রাজাকে সম্মত করেন। এ-বিষয়ে আমলাদের বিরোধিতা তিনি অতিক্রম করেন নিজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায়। কয়েক মাস পরে স্বামীজী তাঁকে আর একখানি চিঠিতে উৎসাহিত করেন : ''সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাকবে না।'' এই বিষয়ে তিনি মঠে ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখছেন, ''গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করেছে। সাবাস!''

স্বামী অখণ্ডানন্দ এইভাবে কাজের সূত্রপাত করে মঠে ফিরে আসেন গুরুভাইদের বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে। তিনি মাঝে মাঝেই কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যেতেন বাংলার প্রসিদ্ধ তীর্থ দেখার বাসনায়। সেই ভ্রমণে তিনি সাধারণ মানুষকে পরিবেশসচেতন করে তুলতেন, অপরিচ্ছন্ন পুকুর দেখলে তা পরিষ্কার করতে নিজেই নেমে পড়তেন, তাঁর দেখাদেখি যুবকেরাও যোগ দিত। তিনি তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে গ্রামের মানুষের বেশির ভাগ অসুস্থতার মূলে জলবাহিত রোগ—অপরিচ্ছন্নতাই যার কারণ। যে-কলেরা মহামারিরূপে গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে দিত, তারও উৎস জল। গ্রামবাংলার আতঙ্ক ম্যালেরিয়াও হত বদ্ধজলে জন্মানো মশার কারণে। তিনি এই বিষয়ে গ্রামীণ মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামীজী দেশে ফেরার পর অসুস্থতার জন্য দার্জিলিং গেলে অখণ্ডানন্দজীও মঠ থেকে বেরিয়ে হুগলি, নবদ্বীপ ঘুরে মুর্শিদাবাদে পৌঁছন। মুর্শিদাবাদের পথেই তিনি সেখানকার দুর্ভিক্ষের খবর পান রাখাল বালকদের কাছে। দাদপুরে তাঁর সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় ও সেখানেই তাঁর সেবাব্রতের সূচনা। তাঁর কথায়, ''দেখিলাম অতিশয় ছিন্নমলিনবস্ত্রপরিহিতা প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি মুসলমান মেয়ে হাপুস নয়নে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহার কাঁকালে একটা মাটির কলসী, তলাটা খসিয়া পড়িয়াছে।'' তিনি তাকে দু'পয়সার একটা মাটির কলসি ও দুপয়সার চিঁড়ে-মুড়কি কিনে দেন। ফল হল তৎক্ষণাৎ দশ-বারোটি ছোট-বড় ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগল, তারা জানাল দুর্ভিক্ষের জন্য তারাও অভুক্ত। তখন তিনি তাঁর শেষ সম্বল তিন আনা দিয়ে চিঁড়ে-মুড়কি কিনে সবাইকে ভাগ করে দিলেন। ক্রমান্বয়ে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনি বুঝলেন, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে তিনি মানুষকে সাহায্য করতে পারবেন না। তাই অন্যত্র গমনে উদ্যোগী হলেন। এমন সময় এক মহিলার একান্ত অনুরোধে এক মরণাপন্ন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীকে সুস্থ করে বহরমপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথে নপুকুর, বেলডাঙা, ভাবতা প্রভৃতি অঞ্চলে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দেখে তিনি বিচলিত হন। ভাবতা থেকে বহরমপুরের উদ্দেশে বার হবেন, এমন সময় অন্তর্দেবতার নির্দেশ পেলেন ভাবতা ছেড়ে চলে না যেতে। ভাবতার কাছে মহুলায় থাকতে আরম্ভ করলেন তিনি। এইসময় স্বামীজী প্রেমানন্দজীকে পাঠানো অখণ্ডানন্দের চিঠিগুলি পড়ে বাস্তব অবস্থা জানতে পেরে দুর্ভিক্ষে সেবাকাজ চালাবার জন্য দেড়শো টাকা এবং স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেনকে পাঠালেন—শুরু হল স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবাব্রত।

স্বামীজী তাঁর সেবাকাজে সন্তুষ্ট হয়ে আলমোড়া থেকে (১৫ জুন ১৮৯৭) লিখলেন, ''সাবাস—তুমি

আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম...। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম-ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহো-ভাগ্যম্।... ঐ রকম কাজ করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর!" এতে অখণ্ডানন্দ প্রভূত প্রেরণা পেলেন। একইভাবে স্বামীজী অখণ্ডানন্দের কাজকে সমর্থন জানিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন (আলমোড়া, ১০ জুলাই ১৮৯৭), ''বহরমপুরে যে প্রকার কার্য হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য কার্য—জীবন জীবন—মতে-ফতে এসে যায় কি?... ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে।... কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?... ঐ কাজ, ঐ কাজ। তারপর লোকের বিশ্বাস হবে, তারপর যা বলবে শুনবে।... দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়; লেকচার, বই, ফিলসফি—সব তার নিচে।"

বহরমপুরের আশপাশের গ্রামগুলিতে প্রায় দুমাস সেবাকাজ চালানোর পরও দেখা গেল দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্যের প্রয়োজন, এর সঙ্গে শুরু হল কলেরার মহামারি। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মানুষ খিদের চোটে যা পেয়েছে খেয়েছে, সেই অখাদ্য-কুখাদ্যের পরিণাম কলেরা। কেউই কলেরা রোগীর সেবা করতে সম্মত নয়। এমনকী ডাক্তারও রোগী দেখতে যেতে ভয় পায়। এই অবস্থায় অখণ্ডানন্দ একাই এগিয়ে গেলেন পীড়িতের পাশে।

তাঁর আন্তরিকতা দেখে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর লেভিঞ্জ সাহেব খুবই সন্তুষ্ট হন। তাঁকে সাহায্যও করেন। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় এই সেবাকাজের বিবরণ প্রকাশিত হলে বাইরে থেকে সাহায্য আসতে থাকে। এইসময় তাঁরা প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করছিলেন। এমন সময় খবর পেলেন গঙ্গার ওপারে রাঙামাটি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কথা। ''রাঙামাটি, চিরুটি, ডাব-কৈ, আঁড়োয়া, যদুপুর, মধুপুর ও বৈদ্যনাথপুর এই সাতখানা গ্রামে যাইয়া দেখিলাম সকলে কচু-ঘেঁচু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে। কাহারও ঘরে একখানি কাঁসার বাসনও ছিল না, সকলেই তাহা বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। বহু লোককে আমি চিরকুট দিয়া মহুলায় আসিয়া চাউল লইয়া যাইতে বলিলাম।"

দুর্ভিক্ষে রিলিফ প্রায় এক বছর চলেছিল। বহু দাতার দানে ও সরকারি সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছিল। এরপর বর্ষার আগমনে গ্রামে গ্রামে কলেরা মহামারিরূপে দেখা দিলে তিনি নিজে গিয়ে রোগীর পরিচর্যা, সেবা, পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। কলেরা প্রতিষেধক গন্ধকের ধোঁয়া প্রতি সন্ধ্যায় ওই সব গ্রামে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। গ্রামে গ্রামে অনাথ শিশু দেখে তিনি মনস্থ করেন এইসব অনাথদের জন্য আশ্রমের পত্তন করবেন এবং সেখানে তাদের জীবনমুখী শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবেন। এ-প্রস্তাব স্বামীজীকে জানালে, তিনি আলমোড়া থেকে তাঁকে উৎসাহ ও আশীর্বাদ জানালেন। কয়েকমাস পর স্বামীজী জোর দিয়ে লিখলেন, ''Orphanage অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" আরও এককদম এগিয়ে তাঁর প্রত্যাশা : ''মেয়েটিকেও ছাড়া হবে না। তবে মেয়ে-Orphanage-এর মেয়ে-সুপারিন্টেন্ডেন্ট চাই...।... মুসলমান বালকও লইতে হইবে বইকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে।" স্বামীজী বারবার অখণ্ডানন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ''আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য।" ভগিনী নিবেদিতা

একটি চিঠিতে অখণ্ডানন্দজীকে জানিয়েছেন : ''কতবার এবং কিভাবে স্বামীজী আপনার কথা বলেছেন, আপনি তাঁর ভাব—যে ভাব আমরা সবাই পেয়েছি—সেগুলি কাজে পরিণত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন। মনে হয় আপনার ওপর তাঁর আস্থা খুব, আপনার কর্মপ্রচেষ্টা সবগুলি তিনি বিশেষভাবে অনুমোদন করেন।''[৪]

অনাথাশ্রম চালাতে গিয়ে অখণ্ডানন্দজীকে নানা অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে। সেবাকাজে প্রথম থেকেই কিছু মানুষ তাঁর বিরোধিতা করে এসেছে। অপপ্রচার, কুৎসা করেছে; সহৃদয় দাতাদের সাহায্য বন্ধ করতে যত নীচতার আশ্রয় নিতে হয় নিয়েছে, সামাজিক বয়কটের হুমকি দিয়ে সাহায্যকারীদের বিরত হতে চাপ সৃষ্টি করেছে। এমনকী তাঁর নামে ফৌজদারি মামলাও হয়েছে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে তিনি অসীম পৌরুষে জয় করেছেন। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা, চেতনা কতই না অনগ্রসর ছিল—সেই পরিস্থিতিতে সহায়-সম্বলহীন সন্ন্যাসী কী অদম্য মনোবল ও ঐশী প্রেরণায় সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে নিজ লক্ষ্য অভিমুখে অভিযান করেন তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই।

নারায়ণজ্ঞানে অনাথ শিশুদের নিজের হাতে তিনি পরিচর্যা করতেন—বালকদের যখন স্নান করাতেন, পুরুষসূক্ত থেকে আবৃত্তি করতেন। নবাগত ধূলিধূসরিত অনাথ বালকের গায়ের ধুলো ঝেড়ে, তেল মাখিয়ে, সাবান দিয়ে গরম জলে যখন স্নান করাতেন তখন তাঁর ভাবখানি—যেন প্রত্যক্ষ নারায়ণের সেবা করছেন। অনাথ শিশুদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বয়নবিভাগ স্থাপন করেছিলেন, কারুশিল্পের মাধ্যমে নানান হাতের জিনিস তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপনার বহু আগেই এসব করে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

অনাথ আশ্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অর্থসংকট ছিল, তা কিছুটা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পরিচিত ধনীব্যক্তিদের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র অন্যতম। তিনি অখণ্ডানন্দজীর চিঠি পেয়ে তাঁকে উপদেশ দিয়ে লেখেন যে সেবাকাজ মানুষকে বন্ধনে ফেলে এবং সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকার্য অপেক্ষা প্রব্রজ্যা, তপস্যা ও স্বাধ্যায়ই প্রশস্ত। এর উত্তরে অখণ্ডানন্দ তাঁকে যে-দুটি চিঠি দেন তাতে ব্যক্ত করেন কী মানসিক অবস্থায় এই গুরুভার তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন এবং পরিষ্কারভাবে জানান, গৃহীর কাজ যদি গৃহী না করে তখন সে-কাজের গুরুভার সন্ন্যাসীকেই বহন করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র অন্তর্নিহিত ভাষ্য বলে এই চিঠিটিকে গণ্য করা যেতে পারে।

চিঠিতে প্রমদাদাস মিত্রের সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি যা লিখেছিলেন, তা তাঁর জীবনীকার স্বামী অন্নদানন্দের মতে, ''সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর জীবনসূত্রের স্বলিখিত ভাষ্য।'' অখণ্ডানন্দজী প্রথম চিঠিটিতে (১৯ অক্টোবর ১৮৯৮) লিখেছিলেন, ''আপনি আমাকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমিও সেই কথা মনে করিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিলাম। সে একদিন গিয়াছে—আর এ একদিন! মনুষ্যাত্মার পরিবর্তন নাই, কিন্তু মনুষ্যজীবনের পরিবর্তন আছে। এখন আর আমার দেশভ্রমণ ভাল লাগে না।

''যখন আমি প্রথমে হিমালয়ে যাই, তখন আমি আর এক মানুষ ছিলাম। আমিই এখন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য হই। তখন আমি হিমালয়ে গিয়া পর্যন্ত মানুষ দেখিয়া বেজার হইয়াছিলাম, এবং পাহাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া অতিশয় বিজন ও হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ পর্বত-শিখরে গিয়া, মনুষ্য-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতে ভালবাসিতাম।... মানুষকে

পরিত্যাগ করিয়া যে আমি একদিন হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মস্তকে মস্তকে বেড়াইতাম, সেই আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি মনুষ্য-সমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। ভগবান যেন আসিয়া আমায় কানে কানে বলিতেছেন : ওরে, এই মানুষই বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও রাম-কৃষ্ণাদি অবতার—এই মানুষই সব।...

''বহুজীবনের কল্যাণসাধন করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা নাই।

''আত্মজ্ঞানলাভ করিতে হইলে নির্জনসেবা করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি চিরকালই করিবে? মনুষ্য যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল হইবে। জীবসেবা করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও উজ্জ্বল হয়,—নিষ্কাম অনুষ্ঠান যে করে তার।... এ নিগূঢ় তত্ত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইহা সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষের হৃদয়েই লুক্কায়িত আছে।''[৫]

দ্বিতীয় চিঠিটিতে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন সেইসব হৃদয়হীন অভিজাতদের, যারা নিজেরা লোককল্যাণে এগিয়ে আসে না, উপরন্তু সেবাব্রতীদের কাজে বাধা দিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে এগিয়ে আসে। তিনি লিখেছেন, ''দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের... অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদানে নির্মিত বা বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।...

''আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, 'ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিস্ নি?' এ-কথা যে শোনে, তার কি স্থির থাকিবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ-জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।''[৬]

সেবাকাজে আত্মনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যে-জবানবন্দি আমরা পেলাম তা বেদান্তোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের প্রত্যয়ী নির্ঘোষ। যিনি নিজের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সর্বজীবে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। অখণ্ডানন্দ সেই মর্মবাণী জীবনে প্রত্যক্ষ করেই বলছেন—''আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে।'' ''আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছি।''

এই রামকৃষ্ণ-তনয় মনেপ্রাণে আদ্যন্ত বৈদান্তিক হয়েও অন্তরাত্মার তাগিদে এবং নেতা বিবেকানন্দের প্রেরণা ও উৎসাহে যেভাবে কর্মযজ্ঞে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তা আজ ইতিহাস। বুদ্ধদেব মানুষের সেবায় সঙ্ঘশক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন, যিশুখ্রিস্ট উপদেশ দিয়েছিলেন—নিজের সকল সম্পদ গরিব মানুষের মাঝে বিলিয়ে দাও, আর নবযুগের স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা নিজেদের নিঃশেষ করে গেলেন জগতের কল্যাণে। বিবেকচূড়ামণি বলছেন, 'সদ্ব্রহ্মকার্যং সকলং সদেবং তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি'—জগতের সব কিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য বলে স্বরূপত সৎ-ই বটে; এই জগৎও ব্রহ্মমাত্র—ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই। তাই ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সামনে-পিছনে, উত্তরে-দক্ষিণে, ওপরে-নিচে ব্রহ্মই একমাত্র পরিব্যাপ্ত, তাই তাঁদের সকল কাজই ব্রহ্মকার্য। তাঁরা তো বিকর্ম-রহিত। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করেছেন অথবা সবরকম শারীরকর্ম ত্যাগ করেছেন—তিনি নন। কাজেই সর্বতোভাবে অখণ্ডানন্দ সন্ন্যাসী ও যোগী, একসময় প্রব্রজ্যা ইত্যাদি পালন করলেও যখন তিনি সব মানুষের মধ্যে নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করছেন তখন তিনি আত্মস্থিত। তিনি বিশ্বরূপী নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁর কাছে—''যস্মিন সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বতশ্চ যঃ।/ যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ।'' ✠

তথ্যসূত্র

১। আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি (৬ মে ১৮৯৫)
২। স্বামী অন্নদানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৮), পৃঃ ৯৩ [এরপর, *স্বামী অখণ্ডানন্দ*]
৩। স্বামী নিরাময়ানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪) পৃঃ ৫৩-৫৪
৪। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ১৬৭
৫। তদেব, পৃঃ ১৫৮-৬০
৬। তদেব, পৃঃ ১৬০

সংগ্রহ

'আমি কি মরে গেছি!'

''(স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠে আসিয়া) স্বামীজীর ঘর শূন্য দেখিয়া অখণ্ডানন্দজীর জীবন শূন্য বোধ হইতে লাগিল; ভাবিতে লাগিলেন, 'সত্যি কি স্বামীজী নেই! ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেই মনে হয়েছিল, জীবনের সব শেষ হয়েছে। হিমালয়ে যাই। স্বামীজীর আহ্বানেই হিমালয় ছেড়ে আসি। সেই স্বামীজীই যখন ছেড়ে গেলেন, তখন আর কেন? এ জীবনের সব প্রয়োজন শেষ হয়েছে।'

''এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অখণ্ডানন্দ একদিন সকালে কালীঘাটে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। উদ্দেশ্য—তাঁহার নিকট স্বামীজীর শেষ দিককার প্রসঙ্গ শুনিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব করিবেন। ফিরিবার পথে ট্রাম লাইনের উপর ভাবিতেছেন, 'আর কেন? এখানেই জীবন শেষ করে দিই।' ট্রাম তখনও কিছু দূরে; এমন সময় দেখিলেন—সম্মুখে দণ্ডায়মান গৈরিক আলখাল্লা-পরিহিত সহাস্যবদন জ্যোতির্ময় মূর্তি! শুনিলেন—স্বামীজী বলিতেছেন, 'আমি কি মরে গেছি!' স্বামীজীর অদর্শনের ঠিক সাতদিন পরে সহসা এই দর্শন ও শ্রবণ অপার আনন্দে অখণ্ডানন্দের মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিল।

''এদিকে ট্রামের ঘন ঘন ঘণ্টার ধ্বনিতে তাঁহার চমক ভাঙে না। তাঁহার চাহনি ও চলন দেখিয়া কণ্ডাক্টর নামিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'ক্যা, বাউরা হো গ্যয়া!' এতক্ষণে তাঁহার চমক ভাঙিল, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। মঠে ফিরিবার পথে চৌরঙ্গীতে ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এই দর্শনের সংবাদ দিলে নিবেদিতা জানাইলেন, ইতিপূর্বে তিনিও স্বামীজীর দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন। স্বামীজীর চিতার অদূরেই মাতৃহারা বালিকার মতোই নিবেদিতা সেদিন কত কাঁদিয়াছিলেন, স্বামীজীর নিত্য আনন্দময় মূর্তির দর্শন পাইয়াই এখন তিনি হাসিয়া আলাপ করিতে পারিতেছেন।''

স্বামী অন্নদানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃঃ ১৮২-৮৩